Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-III, January 2020, Page No. 51-55
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বৈদিক ধর্মের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের সংযোগ

সৌমী পাল
এম.এ, সংস্কৃত বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Though the term 'religion' is expressed in various forms and significance, it is generally explained in perspective of the theology of the Vedas. The hermit-seers of the vedic- age with their unique contemplative spiritual sense, have revealed the deeper me anings of the unexplored theology submerged in ignorance, for the welfare of the mankind. It is not at all easy to explore the mystery of religion. Apparcntly, religion means some external rites and rituals sacrificed for the gods and goddesses, but it is actually not so. Its real meaning is that which upholds the human race. The vedas is divided into two parts-karmakanda and jnankanda. Karmakanda consists of samhita and brahman while jnankanda consists of aranyak and upanishad. The part of the vedas that depicts the rites and rituals is called karmakanda. Mainly, the Brahman section deals with it. And the part of the vedas that describes the 'acquisition of knowledge' is called jnankanda. It is generally found in Aranyak, especially Upanishad. On the other hand, India philosophy admits the Vedas as an authentic source of prehistoric records. Of the six branches of Indian philosophers, two are of course, from the Vedic-Age. Of the two, one is 'Purba-Mimansa' and the other is 'Uttar-Mimansa' or 'Vedanta'. 'jagjagna' or ritualistic religion is for the wordly-people and 'renunciation' or 'redemption' is for the people who are apathetic or unattached to the world the former is related to unhappiness and therefore fleeting, the latter is related to happiness and peace of mind and therefore, eternal or everlasting.

বিষয় প্রবেশ (Introduction): ছয়টি বেদাঙ্গের মধ্যে একটি বেদাঙ্গ হচ্ছে কল্প। বিষ্ণুমিত্রের মতে- "কল্পো বেদবিহিতানাং কল্পনাশাস্ত্রম্"- অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম কল্পিত ও সমর্থিত হয়, তাকে কল্পশাস্ত্র বলে। কল্পসূত্রগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়- ১. শ্রৌসূত্র ২. গৃহ্যসূত্র ৩. ধর্মসূত্র ৪. শুল্বসূত্র। এই ধর্মসূত্র থেকেই ধর্মের উদ্ভব। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে প্রথমেই ধর্মের স্থান। মনুর মতে- 'বেদোহখিলোধর্মমূলক' (মনুসুংহিতা ২/৬)- বেদাই আখিল ধর্মের মূল।

ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা সহজ নয়। আপাতদৃষ্টিতে ধর্ম বলতে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে কিছু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এবং নীতি পালন বোঝালেও এটি ধর্মের স্বরূপ প্রকৃত নয়। ধর্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ 'যা মানুষকে ধারণ করে থাকে'। যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে আদর্শের কত বিভিন্নতা ঘটে। আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে আকাশচুম্বী পার্থক্য দেখা যায়। তাই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির অনুসরণই যদি ধর্মের একান্ত রূপ হতো তাহলে ধর্মের সর্বজনীন কোনো রূপ থাকতো না। ধর্ম কথাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত ও জাতিগত ব্যাপারেই মাত্র বোঝাত।

কিন্তু সনাতন ভারতবর্ষ কখনো ধর্ম বলতে এই সংকীর্ণ অর্থকে বোঝেনি। তার দৃষ্টিতে সকল তুচ্ছতার মধ্যে, সকল আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সকল উত্থান পতনের মধ্যে যা মানুষকে চিরন্তন সত্যে ধারণ করে থাকে তাই ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- "সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ণ করে, সমস্ত বিচ্ছেদ এর মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাকেই ধর্ম বলা যায়"। সভ্যতার আদিযুগ থেকে ভারতবর্ষ এই ধর্মেরই সাধনা করে এসেছে। সেই সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে ধর্ম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার ছিল না, সেখানে ধর্ম, সাহিত্য, সমাজ সব অঙ্গাঙ্গীভাবে এক হয়ে ছিল। বৈদিক সমাজজীবনের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল দেবদেবতার উপর। বৈদিক দেববাদের দুটি দিক- উপাসনা ও যাগ। উপাসনাতে দেবভাবের মাহাত্মাকীর্তন, যাগেতে তাঁহাদের তুষ্টীকরণের উদ্দেশ্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন অংশ যে ঋগ্বেদ তাতে এই দেব ভাবনারই মুখ্যত প্রকাশ দেখা যায়। অধিকাংশ দেবতাদের মহিমা বর্ণনা করে স্তুতিকীর্তন করা হয়েছে। দেবতাই ইহজীবন ও পরজীবনের অভীষ্ট ফলদাতা। নিজের ক্ষুদ্রতর সত্তাকে বৃহত্তর কোনো সত্তার সঙ্গে মঙ্গলের সম্বন্ধে যুক্ত করাই বৈদিক ধর্মের মূল কথা।

বেদের মূলত দুটি প্রধান ভেদ দেখা যায়। একটি কর্মকাণ্ড অপরটি জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। আর জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে আছে আরণ্যক ও উপনিষদ্। বেদের যে অংশ যাগ যজ্ঞাদিক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ আছে সেটি হলো কর্মকাণ্ড। মূলত ব্রাহ্মণ ভাগই কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। বেদের যে অংশে জ্ঞানযোগের কথা বর্ণিত আছে সেটি হল জ্ঞানকাণ্ড। সামান্যতঃ অরণ্যকে বিশেষতঃ উপনিষদেই জ্ঞানযোগের আলোচনা আছে। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ভেদে দ্বিবিভক্ত বেদে কর্মকাণ্ডগত বেদবাক্যার্থবিচারে মীমাংসাদর্শনশাস্ত্র এবং জ্ঞানকাণ্ডগত বেদবাক্যার্থবিচারে বেদান্ত দর্শন শাস্ত্র প্রবৃত্ত হয়েছে, সেইজন্য এই গবেষণাপত্রে মীমাংসা আর বেদান্তের আলোকে বৈদিক ধর্মের রহস্যতত্ব উদ্‌ঘাটন করা হবে। সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য তুলনামূলক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হবে। অতি দুর্গম ধর্মতত্ত্বকে অনুধাবন করতে কল্যাণলিপ্সুব্যক্তিগণ শ্রুতি, স্মৃতি ও শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে আশ্রয় করে আপাতলক্ষ্য অভ্যুদয় ও চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কে দুই ভাগে করা যায় আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শন। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন হচ্ছে আস্তিক দর্শন। আস্তিক দর্শন বেদকে বিশ্বাস করে। নাস্তিক দর্শন হচ্ছে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ। এই নাস্তিক দর্শনগুলি বেদে বিশ্বাসী নয়, বেদে যে ধর্মের কথা উল্লেখ আছে তা এই নাস্তিক দর্শন বিশ্বাস করে না। বেদের দেব দেবীরা সব অচেতন জড় পদার্থ। আশ্চর্যের কথা এই যে কেবলমাত্র বৈদিক হিন্দুরাই এই সব ইন্দ্রাদির উপাসনা করতেন না, পৃথিবীর অনেক সভ্য ও অসভ্য জাতিও এদের উপাসনা করত এবং এখনো অনেকে করে। তাদের মধ্যে দেবতাদের নাম ভিন্ন, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। প্রাচীন আর্য জাতি থেকে জাত রোমান প্রভৃতি জাতিরা কেবলই নয়, হিন্দুরা যে জাতি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, তারাও সেই জাতি থেকে জাত এবং একই দেবতার উপাসনা যে ওদের মধ্যেও প্রচলিত থাকবে- তা খুব একটা আশ্চর্যের কথা নয়। খুবই অবাক করা বিষয়টি এই, যেসব জাতির সঙ্গে আর্যবংশীয়দের বংশগত, স্থানগত বা অন্য কোনো রকম ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নেই, তারাও এই সব ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করত। দিবাসীদের মধ্যেও এই সব দেবতাদের উপাসনা প্রচলিত ছিল, ইতিহাস ঘাটলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন ইন্দ্রাদি দেবতাদের বিশ্বাস করে না।

সমগ্র বেদে প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মভেদে দ্বিবিধ ধর্মতত্ত্ব উপন্যস্ত হয়েছে। তাকে আধার করে এখানে মীমাংসা দৃষ্টিতে বিষয়াসক্ত সংসারিকদের জন্য যাগাদি প্রবৃত্তি ধর্ম এবং বেদান্তদৃষ্টিতে বীতরাগী মুমুক্ষুগণের জন্য নিবৃত্তি ধর্মতত্ত্ব বিবেচিত হয়েছিল। প্রবৃত্তিধর্ম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায় আর নিবৃত্তিধর্ম শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়। একটি ভোগধর্ম আপটি ত্যাগ ধর্ম। তাই ধর্মসামান্যের লক্ষণ করতে উন্মুখ হয়ে বৈশোষিক সূত্রকার বলেছেন 'যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' (বৈশেষিক দর্শন ১/১/২)। মীমাংসা স্বীকৃত প্রবৃত্তিধর্ম আপাত সুখকর হলেও পরিণাম পরিতাপী

হওয়ায় ও দুঃখসম্ভিন্ন সুখজনক হওয়ায় বা দুঃখাধিক সুখের জনক হওয়ায় প্রকৃত সুখকর হয় না। প্রবৃত্তি ধর্মজনিত সুখ কর্মসাধ্য হওয়ায় অনিত্য। কিন্তু বেদান্ত স্বীকৃত নিবৃত্তিধর্ম অনাবিল অপরিমিত নিত্য মুখ্য সুখদায়ক হওয়ায় পরমধর্ম।

"দ্বিবিধো হি বেদোক্তোধর্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষ্শ্চ"- প্রবৃত্তিধর্ম আপাদ সুখকর হলেও এর দ্বারা ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি না হওয়ায় মোক্ষের সাধন হয় না। কিন্তু নিবৃত্তিধর্মে আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক দুঃখের বিনাশ ঘটে বলে এই ধর্ম মোক্ষের সাধন হয়। তাই নিবৃত্তিধর্ম পরমধর্ম। শাস্ত্রে প্রেয় বলতে বোঝানো হয়েছে পার্থিব, পরলৌকিক ভোগ সুখাদি প্রাপ্তি ও তার উপায়কে। শ্রেয় বলতে বোঝানো হয়েছে আত্মজ্ঞান ও তৎপ্রাপ্তির উপায়কে এবং এটিই জীবনের পরম কাম্য।

ভারতীয় দর্শনে যে ছয়টি সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, তাঁদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায় নিঃসংশয়ে বৈদিক বা বেদমূলক। এদের একটি পূর্ব-মীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসা, অন্যট উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত। শাস্ত্রাদিতে পুরুষপ্রবৃত্তিহেতু চতুর্বিধ অনুবন্ধের মধ্যে দ্বিতীয় এবং ধর্মই হচ্ছে বেদবাক্যর্থবিচারাত্মক মীমাংসাশাস্ত্রের বিষয়। যাগদি বেদবিহিত কর্মই ধর্ম এবং সেই ধর্ম নির্ণয়ের জন্যই বেদ ও বেদাঙ্গের অতিরিক্ত মীমাংসাশাস্ত্রের আরম্ভ। মীমাংসা দর্শনে বিচারের কেন্দ্রস্থল হলো ধর্ম অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য বিষয় তাই শাস্ত্রারম্ভে মহর্ষি জৈমিনি" অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" সুত্রে সাঙ্গ বেদের অধ্যয়নানন্তর বেদার্থভূত ধর্মবিচারের কর্তব্যতা উপদেশ করেছেন। বার্তিককার সূত্রাশয়কে স্পষ্ট করতে বলেছেন- "ধর্মখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্"। জিজ্ঞাসা হয় যে, মীমাংসা শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য সেই ধর্ম পদার্থট কি? উহার লক্ষণ কি এবং ধর্মের অস্তিত্বে প্রমাণই বা কি? লক্ষণ বিনা বস্তুর ধারণা হয় না এবং যার স্বরূপই অজ্ঞাত তদ্বিষয়ে বিচার হতে পারে না। তাই সূত্রকার প্রথম সূত্রে ধর্মবিচারের কর্তব্যতা উপদেশ করে দ্বিতীয়সূত্রে বিচার্য ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ নির্দেশ করলেন। এখানে ধর্ম বলতে কোন ধর্মমত বোঝানো হয়নি বা সমাজকে ধারণ করে যে সব আচার-আচরণ, আইন-কানুন তাও নয়। আর 'জিজ্ঞাসা' শব্দের অর্থ' জানার ইচ্ছা' হলেও এখানে গৃহীত হয়েছে গৌণ অর্থ 'বিচার'। অর্থাৎ মীমাংসার মূল সুর হলো ধর্ম বা বেদার্থের বিচার। জৈমিনির দ্বিতীয় সূত্রটি হল- 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' (মীমাংসাসূত্র ১/১/২)। অর্থাৎ ধর্ম হচ্ছে চোদনালক্ষণ অর্থ। ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য হচ্ছে 'চোদনা'। বিবক্ষিত অর্থ হচ্ছে, পুরুষের কর্মবিশেষে প্রবৃত্তিবিধায়ক তথা কর্মবিশেষ হতে নিবৃত্তিবিধায়ক বেদবাক্যই চোদনা। ঈদৃশ বাক্যই বিধিবাক্য নামে প্রসিদ্ধি। ঈদৃশ বিধিবাক্যের দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ জ্ঞাপিত অর্থই ধর্ম। আবার এই বিধ্যাত্মক বেদই ধর্মে অনন্য প্রমাণ। ধর্ম বেদৈকবেদ্য। সূত্রে 'অর্থ' শব্দের দ্বাএয়া অনর্থকে ব্যাবৃত্ত করা হয়েছে। ফলতঃ বেদবিহিত কর্মমাত্রি ধর্ম নয়; পরন্তু যা অনিষ্ঠেতু নয় এমন বেদবিহিত কর্মই ধর্ম। অর্থসংগ্রহে লৌগাক্ষি বলছেন- 'বেদপ্রতিপাদ্যঃ পয়োজনবদর্থো ধর্মঃ।' বেদ ধর্মানুষ্ঠানার্থই ধর্মবিচারকে পুরুষের কর্তব্য বলেছেন। ভট্য মতে ইষ্টসাধন অলৌকিক যাগাদে কর্মই ধর্ম। মীমাংসা নীতি ও ধর্মতত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ হলো বেদবাক্যের অর্থনির্ধারণ। বেদ কেবল ধর্মগ্রন্থি নয়, বেদ প্রাচ্যসভ্যতার অতি মূল্যবান প্রাচীন নথি। বলাই বাহুল্য, এই নথির মর্মোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। বেদে উক্ত পদ ও বাক্যের অর্থ নির্ধারণ অতি দুরূহ ব্যাপার। এই উদ্দেশ্যেই তাই নানা শাস্ত্র রচিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও মীমাংসাশাস্ত্র।

নিরুক্ত মূলত বৈদিক অভিধান গ্রন্থ। এটি বেদের (প্রধানত ঋগ্বেদের) যাস্ক প্রণীত প্রাচীনব্যাখ্যা। কেননা-'যাস্কের সময়ের (আনুমানিক খ্রিঃপূঃ ৬০০-৫০০) বহুপূর্বেই বৈদিকসঙ্হিতাগুলি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিলো। এর দ্বারা সঙ্হিতাগুলির প্রাচীনত্বসম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। যাস্কের সময়ের সঙ্গে সংহিতাগুলির রচনাকালের বিস্তর ব্যবধান না ঘটলে, যাস্কের অনেক পূর্ব থেকেই বেদের দুর্বোধ্যতার ঘটনাটা ব্যাখ্যা করা যায় না। বেদ ব্যাখ্যার প্রাচীনতম প্রচেষ্টা বোধহয় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির 'পদপাঠ'। পদপাঠে মন্ত্রগুলির সন্ধি সমাজ ভেঙে পদগুলি আলাদা করে দেখানো হয়েছে। যুক্ত বা সমাসবদ্ধ পদগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। পদ-পাঠের দ্বারা অন্বয় অর্থাৎ পদগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বুঝতে অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু যে শব্দ বা পদগুলি কেবল বেদেই ব্যবহৃত হয়, লৌকিক সংস্কৃতে হয় না, তাদের সঠিক অর্থনির্ণ্যের সমস্যা থেকেই যায়। এই সমস্যাপূরণের জন্য বেদ ব্যাখ্যার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হল

একটা নতুন পদ্ধতি যাকে বলা হয় 'নিরুক্ত'। 'নিরুক্ত' শব্দের অর্থ 'নির্বচন', অর্থাৎ অনুমিত অর্থ অনুসারে বিশিষ্ট বৈদিক শব্দগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করে, ঐ শব্দগুলি যে মন্ত্রগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে সেই মন্ত্রগুলির একটা সংগত অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব। এই শব্দতালিকাটির নাম 'নিঘণ্টু'। তালিকাপ্রস্তুতিরও একটা পদ্ধতি আছে। প্রথমে, একই অর্থে অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন পৃথিবী অর্থে এতগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে) এ জাতীয় শব্দের একটি তালিকা। তারপর একটা শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা এমন কতগুলি নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দ যার অর্থ নির্ণয় দুরূহ সেসব শব্দগুলির একটি তালিকা। তারপর পৃথিবী, পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল বা আন্তরিক্ষ এবং তারও পরবর্তী 'দ্যুস্থাব বা মহাকাশ- এই তিন স্তরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিভিন্ন দেবতাদের নামের একটি তালিকা। মোটামুটিভাবে এই তালিকা ধরে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক মন্ত্রগুলি যাস্ক ব্যাখ্যা করেছেন। তালিকানুযায়ী এই ব্যাখ্যাকে 'নিরুক্ত বলা হয়, তাই নিরুক্তকে নিঘন্টুর ভাষ্যও বলা হয়- (হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায়; বোইদিক ধর্ম ও মীমাংসা-দর্শন,

প্রচলিত নিঘন্টু ও নিরুক্ত দুটোই যাস্কের রচিত কিনা তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে একথা ঠিক যে যাস্কই প্রথম নিরুক্তকার নন। নিরুক্ত পদ্ধতিতে বেদের ব্যাখ্যা যাস্কের পূর্বেও প্রচলিত ছিলো। এই বিশেষ পদ্ধতিতে বেদব্যাখ্যার একটা সম্প্রদায়ই গড়ে উঠেছিলো, যার নাম 'নৈরুক্ত।' এই নামটি যাস্কের নিরুক্তেই পাওয়া যায়। যেমন, যাস্ক বলেছেন- তিস্র-এর দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ- ... ঐকৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি'- (নিরুক্ত-৭/৫) অর্থাৎ, নৈরুক্ত বা নিরুক্তপন্থীদের মতে মূল দেবতা মাত্র তিনটি- পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বায়ুবা ইন্দ্র এবং দুস্থানে বা মহাকাশে সূর্য, বাকি সব এই তিন দেবতারই বিভিন্ন নাম।

অদ্বৈতমতে ব্রহ্মবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণ করা হয়েছে। মোক্ষের সাক্ষাৎসাধান ব্রহ্মজ্ঞান পরমধর্মরূপে প্রদর্শিত হয়েছে। এখানে কর্ম উপাসনা ও জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা হয়েছে। মুমুক্ষুজন কর্ম ও ভক্তিযোগএর পথে অগ্রসর হয়ে জ্ঞানযোগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয় না। সমন্বোর পর দেটি বন্ধন নিবৃত্তির সাধন হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান মোক্ষের প্রাপ্তিতে সাক্ষাৎসাধন বলেচ ব্রহ্মজ্ঞান পরম ধরম বলে অভিহিত।

অদ্বৈতয়াচার্যগন বলেছেন- 'স্বরূপঃ প্রমাণৈর্বা সর্ব্বজ্ঞত্বং দ্বধা স্থিত্মম্।' এই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর সকল জীবন হৃদয়গুহায় অবস্থাসনপূর্ব্বক বুদ্ধি-নিয়মন করেন বলিয়া 'অন্তর্যামী' শব্দেও কথিত হন। 'য আত্মনি তিষ্ঠান্' 'যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্' প্রভৃতি শ্রুতি এবং 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি। ইত্যাদি স্মৃতিতে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব জীবনিয়াকমত্ব ঘোষিত হয়েছে। ঈশ্বর যে কেবল জীবের অন্তরে থাকিয়া জিবকে নিয়ন্ত্রিত করেন তাহা নহে, তিনি সর্বত্র অনস্যূত হইয়া সর্বস্তকেই পরিচালিত করেন। তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক সকল শরীরকে নিয়োমিত অর্থাৎ স্বকার্যে নিয়োজিত ও সুশৃঙ্খল করছেন। ঈশ্বর ইহলোক ও পরলোক তথা সকল জীবের অন্তরে থেকে তৎসমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন, যিনি পৃথিবীতে অনুস্যত হইইয়া পৃথিবী কে নিয়মিত করেন- 'য ইমঞ্চ লোকং পরঞ্চ লোকং সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি', 'য পৃথিবীম্ অন্তরা যময়তি' প্রভৃতি শ্রুতি ঈশ্বরের সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রচারিত করেছে।

ঈশ্বর স্বতঃ কাহাকেও অনুগ্রহ করেন না। তিনি পর্জন্যের মত বা সূর্যের মত নিষ্পক্ষপাত ভগবান বলেছেন -'ন হি তিস্মিন্ হিতাকণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে, ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্তব্যমস্তি অহিতং বা পরিহর্তব্যম্; নিত্যমুক্তস্বভাবত্বাৎ।' বস্তুতঃপক্ষে জীব যদি অহংবুদ্ধিকে বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ- কে আর ক্রূর বা ঈশ্বরের সৃষ্টি কে বিষম বলিয়া মনে হবে না। তখন তিনি দেখবেন- " He (God) is the Great poet, the ancient poet; the whole universe is his poem, coming in verses and rhymes and rhythms, written in infinite bliss."- স্বামী বিবেকানন্দ। ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ত্ব ও পূর্ণত্বকে অবলম্বন করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব দার্শিক চিন্তা ও সামাজিক পরিকল্পনা কার্যে পরিণত বেদাঙ্গের যে প্রসার ঘটিয়েছিলেন তারই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি গিরিগুহা ও অরণ্যস্থিত বেদাঙ্গকে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা করে সমাজের সর্বস্তরে তার প্রয়োগের বিশেষ চেষ্টা করেছেন। পুত্র, আয়ু ধন- সম্পদ লৌকিক অভ্যুদয় ও পরলৌকিক স্বর্গরূপ অভ্যুদয়ের অনন্য সাধন হওয়া মীমাংসা পরিদর্শিত প্রবৃত্তিধর্মের অনুশীলন অভ্যুদয়ার্থী ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন জীবনে একান্ত উপযোগী

মীমাংসাশাস্ত্রপ্রাক্ত ধর্মতত্ত্বে স্বার্থ সংকীর্ণতা থাকলেও বেদান্তোদ্ভাবিত ধর্মতত্ত্বে তার কোনো অবকাশ নেই। বেদান্ত সর্বজনীন এক উদার ধর্মনীতি প্রচার করেছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতাদর্শের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে। বেদান্তোপদিষ্ট ধর্মতধর্মতত্ত্ব বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা সাধন করে চিত্তকে উদার করে। "উদারচরিতানাস্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্" উদারচিত্ত ব্যক্তি সর্বজীবে দৃষ্টি সম্পন্ন হন সুতরাং সম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রপীড়িত বর্তমান বিশ্বের সংকটমোচন বেদান্তের ধর্মোপদেশ একান্ত উপযোগী।

বৈদিক কর্মের দ্বারা বিশোধিতচিত্তে উপাসনা স্তর উন্মেষিত হয়। উপাসনার স্তর হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবকে অগ্রসর করে দেয়। এরপর ক্রমশ চিত্তের একতানতার অবিচ্ছিন্ন অনুশীলনে জ্ঞানমার্গের পথ প্রশস্ত হয় তখন তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য বিচার বিশুদ্ধজীবের খণ্ডসত্তাকে অখণ্ড আনন্দময় পরমাত্মসত্তায় নিত্য আনন্দ সঙ্গমে সম্মলিত করার জন্য অগ্রসর হয়। এই পর্যন্তই জীবের সাধনার স্তর, এরপর জীবকে স্বয়ং পরম ব্রহ্ম নিজ অখন্ড সত্তায় বরণ করেন- "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে অনূং স্বাম্" এই নিয়মানুসারে। এখানেই মীমাংসাদর্শন ও বেদান্ত দর্শনের আত্যন্তিক সমন্বয় সম্পূর্ণভাবে সাধিত হয়। বিষয়টির ন্যায়সঙ্গত (Justification of the Topic): বৈদিক ধর্মকে এই গবেষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকান্ডের সঙ্গে মীমাংসাদর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্তদর্শনশাস্ত্রকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই গবেষণাপত্রের বিষয়টির মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যায়।

গবেষণার কার্যক্ষেত্র (Area of Research): এই গবেষণাপত্রটিকে মূল কাজ বৈদিক ধর্মের সঙ্গে মীমাংসাদর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্তদর্শাস্ত্রলে সংযুক্ত করা।

গবেষণাপত্রটির উদ্দেশ্য (Research Objectives):

- বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা।
- বৈদিক ধর্মের সঙ্গে মীমাংসাদর্শনশাস্ত্র এবং বেদান্তদর্শনশাস্ত্রকে সংযুক্ত করা।
- প্রবৃত্তি ধর্ম এবং নিবৃত্তি ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

- এ গবেষণাপএটি প্রস্তুতির জন্য বেদের ভাষ্যগুলির সামান্য অধ্যায়ন করে বর্ণনাত্মক এবং বিবেচনাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।
- করমকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড তথা প্রবৃত্তি ধর্ম ও নিবৃত্তি ধর্মের তুলনার মাধ্যমে তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

গন্থপঞ্জি:

১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়- ভারতীয় দর্শন ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-২০০৭ সাল।
২. বিপদভঞ্জন পাল-বেদান্তসারঃ- সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-১৪২২ সাল
৩. স্বামী অমৃতত্বানন্দ- বেদান্তসারঃ- উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা- ১৯৯৮ সাল
৪. ওঁঙ্কারনাথ সীতারামদাস-শ্রী ওঁঙ্কারনাথ রচনাবলী-শ্রীগুরু পকাশন মহামিলন মঠ-১৩৮৯ বঙ্গাব্দ।
৫. তর্কবাগীশ ফণিভূষণ-ন্যায়পরিচয়-বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ- ১৩৪০ বঙ্গাব্দ।
৬. লাহিড়ী দূর্গাসাস-পৃথিবীর ইতিহাস (ষষ্ঠ খণ্ড)- পৃথিবীর ইতিহাস কার্যালয়- ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।
৭. যোগাত্রয়ানন্দ- আর্যশাস্ত্র প্রদীপ-প্রাচী পাবলিকেশন- ২০১০ সাল।